Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-III, April 2024, Page No.09-17
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ঔপনিবেশিক কালপর্বে বাংলা সাহিত্য প্রকাশনার জগতে লিঙ্গরাজনীতি

প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল

এম.ফিল, ইতিহাস বিভাগ, ডায়মণ্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, সরিষা, দঃ চব্বিশ পরগণা, ভারত

Abstract:

The main discussing point of the proposed article is the gender politics that emerged in the publication of Bengali women's writings in the colonial period. In the second half of the 19th century, the spread of women's education and the advancement of the printing industry created a category of women readers in Antahpur (the inner domain of the household). Similarly, from that category, a new section was also originated—they were named 'Lekhika' or 'female author'. They expressed their thoughts and opinions about the position of women on contemporary socio-economic and political grounds. However, a major portion of patriarchal society could not welcome such authors with open mind. Because male-dominated societies have always wanted to confine women's thinking within the limits of their own set of rules. The discussion of logic or political or economic issues in women's writings was unexpected. Rather, society expected women's writings to be 'feminine' in line with the so-called socially constructed trait of 'softness'. In this way the male society has repeatedly interfered with in independent deliberation of women in several ways. In short, the voice of Indian women in history is suppressed through gender discrimination in the area of writings. On this point, the article fundamentally asks the questions whether the contemporary readers acclaimed the writings of Bengali women, how the patriarchs reacted on these or in which ways women had to face problems to publish their writings in periodicals.

Keywords: Gender Politics, Female Authors, Colonial Bengal, Periodicals, Patriarchy.

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ও মুদ্রণশিল্পের ফলস্বরূপ অন্তঃপুরে যেমন পাঠিকা সমাজ তৈরী হয়েছিল, তেমনই আবার তাদের মধ্যে থেকে সমাজে এক নতুন শ্রেনীর আবির্ভাব হয়েছিল ---- লেখিকা বা মহিলা লেখক। যেসব মেয়েরা সেদিন লেখাপড়া করার সুযোগ পেয়েছিলেন তারা নানান সাময়িক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সাহিত্য সাধনায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। পত্রপত্রিকায় লেখার মাধ্যমে মেয়েদের জীবন যন্ত্রণার কথা জনসমক্ষে তুলে ধরাই ছিল লেখিকাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। আর এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই অন্তঃপুরের সীমানার বাইরে তাঁরা নিজেদের সত্তা, মনন, ভাবনাচিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। তবে লেখালেখির জগতে নারীর এই অনুপ্রবেশকে পুরুষ প্রভাবিত সমাজের অনেকেই সেদিন মুক্ত মনে স্বাগত জানাতে পারেননি। পুরুষশাসিত সমাজ বরাবরই তার নিজস্ব নিয়ম কাঠামোর মধ্যেই আবদ্ধ রাখতে চেয়েছে নারীর সৃষ্টিশীল চেতনাকে। মেয়েদের লেখায় কোনোরকম যুক্তিতর্ক বা

জটিলতাপূর্ণ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বিষয়ে আলোচনা সমাজের কাছে কাঙ্ক্ষিত ছিল না। বরং মেয়েদের কলমে তথাকথিত সমাজনির্মিত বৈশিষ্ট্য 'কোমলতা'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ 'স্ত্রীজনোচিত' লেখাই সমাজ প্রত্যাশিত ছিল। এইভাবে লেখালেখির ক্ষেত্রেও মেয়েদের স্বাধীন চিন্তাভাবনায় বারংবার হস্তক্ষেপ করেছে পুরুষ সমাজ, তাদের মননচর্চাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে নানাভাবে। এক কথায়, লেখালেখির জগতেও লিঙ্গপ্রভেদকে প্রাধান্য দিয়ে ভারতীয় ইতিহাসে নারীর কণ্ঠস্বরকে চাপা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধটির আলোচনার কেন্দ্রে থাকবে ঔপনিবেশিক কালপর্বে বাঙালি মেয়েদের লেখা মুদ্রিত মাধ্যমে প্রকাশনার ক্ষেত্রে উদ্ভূত লিঙ্গরাজনীতি প্রসঙ্গটি। আলোচ্য প্রবন্ধে আমি, তৎকালীন বাংলা সাময়িকপত্রে মেয়েদের লেখা প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল? সমকালীন পাঠক মহলে তাদের লেখা সমাদৃত হয়েছিল কি? সর্বোপরি সাময়িকপত্রে লেখনীর মাধ্যমে মেয়েদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রটিকে কি ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল - এই সমস্ত বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

বলা বাহুল্য যে, আলোচ্য কালপর্বে আবেগ প্রবণতাই ছিল মেয়েদের সমাজ নির্দিষ্ট লিঙ্গবৈশিষ্ট্য। আর তাই মেয়েদের লেখা আবেগপূর্ণ-কল্পনাপ্রবণ কবিতা সহজেই স্থান পেয়ে গিয়েছিল মুদ্রিত জগতে। কিন্তু চেষ্টা করলে মেয়েরাও যে যুক্তিপূর্ণ চিন্তাশীল প্রবন্ধ লিখতে পারে --- এ বিষয়টা তৎকালীন সমাজের কাছে হয়তো খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। অন্ততঃপক্ষে, মেয়েদের লেখালেখির শুরুর দিকে তো বটেই। 'যে মেয়েরা এযাবৎকাল পর্যন্ত অজ্ঞানতার অন্ধকারে ছিল, অক্ষরজ্ঞানও হয়নি ঠিকমতো, তারা আবার কি সাহিত্য রচনা করবে?'--- মেয়েদের লেখা সম্পর্কে এমনই চিন্তাভাবনা পোষণ করত তৎকালীন সমাজ। আর তাই যখনই স্বনাম স্বাক্ষরিত মেয়েদের কোনো যুক্তিমূলক গদ্য পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত হত, তখনই সেই লেখার সঙ্গে থাকত সম্পাদক কিংবা কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রমাণপত্র।

১৮৬০ সালে *'সোমপ্রকাশ'* পত্রিকায় প্রকাশিত বামাসুন্দরী দেবীর 'কী কী কুসংস্কার তিরোহিত হইলে শীঘ্র এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে' শীর্ষক গদ্য প্রবন্ধ কিংবা ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত কৈলাসবাসিনী দেবীর প্রবন্ধ পুস্তক ----উভয়ক্ষেত্রেই পাঠকবর্গ সন্দেহ করতে পারে এমন আশঙ্কা করে লেখার শুরুতেই ছিল সম্পাদকের দেওয়া প্রমাণপত্র।

১২৬৯ বঙ্গাব্দে লেখা বামাসুন্দরী দেবীর 'ভারতবর্ষীয় রমণীগণের দুরবস্থা মোচনের উপায় কী?' নামক রচনার গোড়াতেই ছিল *সোমপ্রকাশ* পত্রিকার সম্পাদকের একটি নোট ---

> "আমরা আজি একখানি প্রেরিত পত্র পাঠকগণের গোচর করিতেছি; ...ইহা একজন বিদ্যাবতী স্ত্রীলোকের লিখিত।... তাঁহার বাংলা লিখিবার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। অনেক পুরুষে যেমন স্ত্রীলোকের নাম দিয়া আপনাদিগের লিখিতপত্র সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া থাকেন, ইহা সেরূপ নহে, ইহা যথার্থই কোমল কর হইতে বিনির্গত হইয়াছে।"[১]
>
> কৈলাসবাসিনী দেবীর 'হিন্দুমহিলাগণের হীনাবস্থা' বইয়ের সঙ্গেও আনন্দচন্দ্র বেদান্ত বাগীশ এর লেখা একটি প্রমাণপত্র ছিল--- 'বইটি কৈলাসবাসিনী দেবীর নিজেরই রচনা'।[২]

১৮৬৫ সালে *বামাবোধিনী* পত্রিকার বামারচনা বিভাগে বিবি তাহেরণ নেছার স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল, সেক্ষেত্রেও তাকে প্রমাণ দিতে হয়েছিল। ১৮৬৪ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে এই পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে তাহেরণ নেছা সহ পাঁচজন মহিলার উদ্দেশ্যে বলা হয়ঃ- 'রচয়িত্রীরা অনুগ্রহপূর্বক ভাল করিয়া প্রমাণ দিয়া পাঠাইলে' তাদের রচনা প্রকাশিত হবে।[৩]

অনেকেই বলেন, 'স্ত্রীদের ছদ্মনামে কোনো পুরুষ লিখছেন কিনা' -- সেই সংশয় দূর করতেই এই ব্যবস্থা। কিন্তু এই ধরণের নিয়ম শুধু মেয়েদের লেখা গদ্য-প্রবন্ধের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হত কেন? আবেগপূর্ণ কবিতার ক্ষেত্রে নয় কেন?--- পুরুষের পক্ষে কি আবেগপূর্ণ কবিতা লেখা সম্ভব নয়, নাকি মেয়েরা যুক্তিপূর্ণ গদ্য লিখতে অপারক? শুধু উনিশ শতকেই নয়, বিশ শতকের গোড়ায় ও মেয়েদের লেখা সম্পর্কে এ ধরণের সংশয় কাটিয়ে উঠতে পারেনি সমাজ। ১৩২৮ সালে জ্যোতির্ময়ী দেবীর লেখা 'নারীর কথা' নামক প্রবন্ধটির কঠোর সমালোচনা করে মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় লিখেছিলেন---"এ ছদ্মনামে পুরুষের রচনা। মেয়েরা এরকম লিখতে পারেন না।"[৪]

১৩৩৭ বঙ্গাব্দে ২৫শে জানুয়ারি কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের সারস্বত সম্মিলন সভার বক্তৃতায় রাধারানী দেবী বলেছিলেন --- "কিছুদিন আগে ভাগলপুরের শ্রীমতী আশালতা দেবীর প্রবন্ধ-রচনা পড়ে অনেক সমালোচকই সে রচনাগুলি পুরুষের লিখিত বলে নিঃসন্দেহ মত প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি। নারীর লেখনী এমন কিছু সৃষ্টি করতে পারে, বা নারীর চিন্তাশীলতা, যুক্তিশীলতা এত গভীর হতে পারে, এ-কথা তাঁরা বিশ্বাস করতে পারেননি।"[৫]

মেয়েরা যখন প্রথম লেখার জগতে প্রবেশ করেছিলেন তখন অনেকেই সমাজ ও পরিবারের ভয়ে নিজপরিচয়ে, স্বনামে লিখতে সাহস করে উঠতে পারেনি। ১৮৩১ সালে *সম্বাদ-কৌমুদী* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠির রচয়িতা 'অমুকী দেবী' ছদ্মনামে কুলীনবিবাহ, বহুবিবাহপ্রথাজনিত কারণে নিজের হতভাগ্য জীবনের দুঃখ-দুর্দশার কথা জানিয়েছিলেন। ১৮৩৫ সালে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের দাবিতে *সমাচার দর্পন*-এ প্রকাশিত মেয়েদের লেখা চিঠি দুটিতেও রচয়িতার পরিচয় হিসেবে জানা যায়--- তারা শান্তিপুরনিবাসিনী ও চুঁচুড়ানিবাসী স্ত্রীগণ। ১৮৪০ সালে *সমাচার দর্পন*-এ আরও একটি চিঠি প্রকাশিত হয় 'তা বি হ ক গ শ জ ম গৌ ইত্যাদি' ছদ্মনামে। অর্থাৎ পুরুষ সমাজের প্রচলিত নিয়মনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে মেয়েদের কলম ধারণের শুরুটা হয়েছিল কিন্তু ছদ্মনামের আড়ালেই। যদিও অনেকে আবার মনে করেন যে উপরোক্ত চিঠিগুলি ছদ্মনামের আড়ালে কোনো পুরুষের রচনা।

তবে ১৮৫৫ সালে *'সম্বাদ ভাস্কর'* এ প্রকাশিত শ্যামাসুন্দরী বসুমল্লিকের চিঠি--- সম্ভবত মেয়েদের নামপদবী স্বাক্ষরিত প্রথম চিঠি। নামের সাথে দেবী কিংবা দাসী না লিখে পদবি যুক্ত করার সপক্ষে যুক্তিও দিয়েছিলেন শ্যামাসুন্দরী। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মেয়েরা পদবি যুক্ত না করলেও স্বনামেই লেখা ছাপাতে শুরু করেছিলেন। পদবিসহ স্বনামে আত্মপ্রকাশ করতে আরও কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হয়েছিল অবরোধবাসিনীদের। তবে স্বনামে লেখা প্রকাশের পর সমাজ কি ভাববে, পরিবারের লোক কি মনে করবে--- এই শঙ্কা কিন্তু তাঁদের মনের মধ্যে থেকেই গিয়েছিল। জ্যোতির্ময়ী দেবীর মনের মধ্যেও এমনই ভয়, সংশয় কাজ করেছিল তাঁর প্রথম লেখা মুদ্রিত মাধ্যমে প্রকাশকালে। তিনি এপ্রসঙ্গে পরবর্তীকালে লিখেছিলেনঃ

> "আমিও লেখা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই শ্বশুরকুল পিতৃকুল 'অ-কুল' সবাই কে কি ভাবছেন ভেবে লজ্জিত ও ভীত হয়েছিলাম। কারণ মেয়েদের লেখা নৈর্ব্যক্তিকভাবে কোনো সমাজ বা পুরুষ তো দেখেন না, এই হল সমাজের অনুশাসন।"[৬]

তবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পর থেকে মেয়েদের যে একেবারেই ছদ্মনাম ব্যবহার করার প্রয়োজন পরেনি তা নয়। বরং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এমন অনেক লেখাই পাওয়া গিয়েছে যা বেনামে বা ছদ্মনামে লিখিত। আর এইসমস্ত বেনামে লেখা মেয়েদের রচনাগুলির অধিকাংশেরই বিষয়বস্তু পুরুষতন্ত্রের সমালোচনা। অর্থাৎ যখনই মেয়েরা পিতৃতান্ত্রিক বিধিনিষেধের সমালোচনায় মুখর হয়েছে,

পুরুষনির্মিত নারীসত্তার বিনির্মাণ করতে চেয়েছে তখনই তারা স্বীয় অবরোধের আড়ালকেই বেছে নিয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ১৩২৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'গৃহস্বামীর কর্তব্য'[৭] শীর্ষক একটি রচনার কথা। যেখানে রচয়িতার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। সেযুগে মেয়েদের কর্তব্য মূল্যবোধ নিয়ে অনেক লেখালেখি হলেও পুরুষেরও যে কোনো কর্তব্য থাকতে পারে--- এবিষয়ে তেমন কোনো লেখা হয়তো পুরুষের লেখনীতেও বিরল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে পুরুষের কর্তব্য, তার মূল্যবোধ সম্পর্কে অবহিত করা মেয়েদের পক্ষে তখনও যে খুব সহজ কাজ ছিল না--- সেটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে লেখিকার পরিচয় গোপনীয়তার মধ্য দিয়ে।

তবে শুধুমাত্র পুরুষতন্ত্রের সমালোচনার উদ্দেশ্যেই নয় অনেকসময় মেয়েদের লেখা সমাজে কিভাবে গৃহীত হবে? তাদের লেখার সঠিক মূল্যায়ণ হবে কিনা --- সেই আশঙ্কা থেকেও অনেক লেখিকা নিজের নাম গোপন করে লিখতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সরলাদেবীর ভারতীতে লেখা 'প্রেমিকসভা' নামে একটি গল্প অস্বাক্ষরিতভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, যা সেকালের পাঠক সমাজে খুবই প্রশংসিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিক্রিয়া ছিল – 'নাম দিসনি বলে তোর এ লেখার ঠিক যাচাই হল'।[৮]

কেননা সে সময় মেয়েদের লেখাকে 'মেয়েদের লেখা হিসেবে ভালো' বলে একধরণের পিঠ চাপরানির মনোভাব কাজ করত পুরুষ সমালোচকদের মধ্যে। এ প্রসঙ্গে রাধারাণী দেবীর মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য---

> "সাহিত্য-বিচারে নারী-পুরুষ ভেদটা আমাদের দেশের সমালোচকদের মধ্যে খুব বেশিরকম প্রবল দেখতে পাওয়া যায়। প্রায়ই চোখে পড়ে কেউ না কেউ লিখছেন, -- অমুক মহিলাটির রচনা মন্দ নয়, মেয়েছেলের লেখা হিসাবে বেশ ভালোই বলতে হবে—' ইত্যাদি। সাহিত্য-বিচারে মেয়েদের জন্য এই যে একটা আলাদা রকম মাপকাঠির বিশেষ ব্যবস্থা...এটা মহিলা-সাহিত্যিকদের পক্ষে যতখানি অমর্যাদাকর, তার চেয়েও ঢের বেশি অমর্যাদাকর সেই সমালোচকদের পক্ষে; কারণ, সাহিত্য-বিচারে সমালোচকের দায়িত্ব গুরুতর। তাঁকে শুধু সম্যক আলোচনাই নয়, সম-আলোচনাও করতে হবে।"[৯]

একথা অনস্বীকার্য যে, শুরুর দিকে বেশ কিছু সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকরাই মেয়েদের গদ্য রচনার জন্য উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। তবে তার সাথে সাথে এটাও তাঁরা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন মেয়েরা কী ধরণের বিষয় নিয়ে লিখবেন। 'আদর্শ সতী স্ত্রী'; 'সতীত্ব ও পাতিব্রতধর্ম'; 'রমণীর কর্তব্য'; 'স্ত্রীর প্রতি স্বামীর উপদেশ'; 'হিন্দুনারীর গার্হস্থ্যধর্ম'--- এইধরণের বিষয়ই ছিল মেয়েদের জন্য নির্ধারিত। এই নির্ধারিত ছকের বাইরে কোনো গুরুগম্ভীর বিষয়ে মেয়েরা নিজেদের মতামত লিখলে, হতভাগ্য মেয়েদের ক্ষীণবুদ্ধি যে এমন উচ্চ ও বিশুদ্ধ চিন্তাভাবনা করতে পেরেছে--- তা দেখে আহ্লাদিত হতেন। লেখার জগতে মহিলাদের উৎসাহ প্রদানে বামাবোধিনী পত্রিকার অবদানও কম ছিল না। তবে সবক্ষেত্রে বামাবোধিনী গোষ্ঠী নারীর স্বাধীনতা স্বীকার করে নিতে পারেনি। তারা নারীর লেখাকে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছে তাদের নির্ধারিত বিষয়ভিত্তিক সীমানার মধ্যে। মেয়েদের লেখার উপরেও যে, পুরুষপ্রধান সমাজের একটা অলক্ষ্য অঙ্গুলি নির্দেশ ছিল তা বোঝা যায় পত্রিকায় প্রকাশিত অধিকাংশ প্রবন্ধের ছকে বাধা শিরোনাম দেখে।

শুধু *বামাবোধিনী* পত্রিকাই নয়, বিশ শতকের *প্রবাসী* পত্রিকার প্রগতিশীল সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কথাও বলা যায় এ প্রসঙ্গে। তিনি নারী লেখনী তথা নারী প্রসঙ্গকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া সত্ত্বেও তাদের লেখনীকে সীমায়িত রাখতে চেয়েছিলেন বিশেষ গণ্ডির মধ্যে। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস

করতেন পুরুষরা থাকতে রাজনৈতিক সংগ্রামে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ কাম্য নয়, তাই তাঁর সম্পাদিত *'প্রবাসী'* পত্রিকাতেও কখনোই মেয়েদেরকে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কোনো লেখাই সেভাবে প্রকাশিত হয়নি। পাঠিকাকুলের উদ্দেশ্যে চিত্ত বিনোদনকারী গল্প-উপন্যাস কিংবা সেবার ভাব ও সুনীতিবোধ জাগরণ উপযোগী কিছু প্রবন্ধই ছিল লেখিকাকুলের জন্য বরাদ্দ বিষয়বস্তু। অর্থাৎ বরাবরই নারী লেখনীকে সীমিত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে গার্হস্থ্য, দাম্পত্য, মাতৃত্ব কেন্দ্রিক আলোচনার মধ্যেই।

ঘরে-বাইরের ক্ষোভ-অভিযোগের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর মেয়েদের লেখায় প্রতিফলিত হোক এমনটা কখনোই চায়নি পুরুষসমাজ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বেগম রোকেয়ার লেখা প্রবন্ধের সংকলন *'মতিচূর'* এর একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল *নবনূর* পত্রিকার ১৩১২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায়। সেখানে গ্রন্থসমালোচক মৌলভী আবদুল করিম মন্তব্য করেছিলেন---

> "মতিচূর-রচয়িত্রী কেবল ক্রমাগত সমাজকে চাবকাইতেছেন, ইহাতে যে কোন সুফল ফলিবে – আমরা এমত আশা করিতে পারি না। তিনি যদি সংযতভাবে বিদ্বেষহীন ভাষায় নারীজাতির দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিতে পারেন তাহা হইলে সমাজে রক্ষণশীলত্বের বন্ধন আপনাআপনি শিথিল হইয়া আসিবে...।"[১০]

তাঁর এই মন্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, পাঠক সমাজ চায় মেয়েদের লেখায় 'স্ত্রীজনোচিত শান্তভাব' বজায় থাকুক। মেয়েরা তাদের অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-যন্ত্রণার কথা বলুক, কিন্তু তা অনুনয়-বিনয়ের সুরে। এর আগেও ১২৭৭ বঙ্গাব্দে *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকা *'বঙ্গমহিলা'* পত্রিকার সম্পাদিকাকে 'স্ত্রীজনোচিত শান্তভাব' বজায় রাখতে নির্দেশ দিয়ে সচেতন করেছিল---"...আশা করি কয়েক সংখ্যা পত্রিকাতে যেমন স্ত্রীজনোচিত শান্তভাব প্রকাশ পাইতেছে, চিরকালই সেরূপ দেখিতে পাইব। সম্পাদিকা যদি অনুচিত বিজাতীয় অনুকরণে ব্যগ্র না হইয়া আমাদের বাস্তবিক অবস্থা বুঝিয়া ও সমুচিত স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া প্রস্তাব সকল প্রকটিত করেন, এখানি ভদ্রসমাজে আদরণীয় হইবে।"[১১] অর্থাৎ মেয়েদের লেখা ভদ্রসমাজে আদরণীয় হওয়ার প্রথম শর্ত 'স্ত্রীজনোচিত শান্তভাব' বজায় রাখা।

অনেক সময়, মেয়েদের স্বাধীন সত্তার নিজস্ব স্বর প্রকাশের পথকে অবরুদ্ধ করে পুরুষ নির্দেশিত মতাদর্শে, পুরুষের বকলমে লেখনী ধারণ করতে যে বাধ্য করা হতো তারও আভাস পাওয়া যায় বেশ কয়েকজন লেখিকার প্রবন্ধের ধরণে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নগেন্দ্রবালা মুস্তাফীর কথা। তিনি ১৩০২ সালের বৈশাখে *বামাবোধিনী* পত্রিকায় প্রকাশিত 'অবরোধে হীনাবস্থা' প্রবন্ধে লিখেছেনঃ "আমরা পিঞ্জরের পাখির ন্যায় নিয়ত অবরোধ রূপ পিঞ্জরে আবদ্ধ রহিয়াছি"।[১২] তিনিই আবার ১৩০২ সালের আশ্বিন সংখ্যায় লিখেছেনঃ "আমাদের অবস্থা কি কারারুদ্ধ বন্দীর অবস্থার ন্যায় ছিল? অন্তঃপুর কি কারাগারতুল্য ভয়াবহ স্থান?... বিদেশীদের রটনামাত্র"।[১৩] লিঙ্গরাজনীতি কিভাবে মেয়েদের কলমকে চালিত করে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। না হলে এতটা স্ববিরোধী বক্তব্য শুধুই তাঁর মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের প্রতিফলন হতে পারে না। কৃষ্ণভাবিনী দাসের লেখাগুলিও যদি ধারাবাহিকভাবে পড়া হয় তাহলে দেখা যায় যে, লেখার সূচনাপর্বে তাঁর প্রবন্ধগুলি (স্ত্রীলোক ও পুরুষ; শিক্ষিতা নারী)-তে যে প্রতিবাদী সুর স্পষ্ট ছিল, পরবর্তীকালের লেখাগুলিতে সেই নারীবাদী চেতনার স্বর অনেকটাই নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। তবে শুধু লেখার জগতেই নয়, কৃষ্ণভাবিনীকে তাঁর পারিবারিক ক্ষেত্রেও সহ্য করতে হয়েছিল পুরুষতন্ত্রের প্রবল প্রহার। তাই একসময়ের যুক্তিনিষ্ঠ সাহসী কণ্ঠস্বরের পরিবর্তে তাঁর লেখায় শোনা গেছে বৈধব্যের ব্রহ্মচর্যের প্রশস্তি। অপরদিকে আরও এক প্রতিবাদী কণ্ঠের অধিকারী স্বর্ণকুমারী দেবীকেও সহ্য করতে হয়েছিল সাহিত্যিক হিসেবে পুরুষের তাচ্ছিল্য। তাঁরই খ্যাতনামা ভাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যিক হিসেবে যে তাঁকে খুব একটা সুনজরে দেখতেন না তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে বহুক্ষেত্রে। রাণী চন্দকে লেখা চিঠিতে

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল--- "...পুরুষদের ও মেয়েদের build সবদিক থেকেই আলাদা।...ধর না কেন, আমি যদি আমার ন'দিদি হতুম, তবে কি এমনি আমার জায়গায় আমি উঠতে পারতুম? সংসারের বাধা বিঘ্ন ছেড়ে দে, তা না হোলেও, মেয়েদের brain এতটা কাজ করতেই পারেনা।"[১৪]

এছাড়াও বিখ্যাত চিত্রশিল্পী রোটেনস্টাইনকে লেখা একটি চিঠিতে স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন--- "She is one of those unfortunate beings who has more ambition than abilities."[১৫] শুধু স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পর্কেই নয়, সামগ্রিকভাবে নারী লেখনী সম্পর্কে খুব একটা উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন না রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মতে, 'মেয়েদের ধারণাশক্তি থাকলেও সৃজনশক্তি নেই'। তাছাড়া তিনি বাস্তবতাহীন কল্পনাচারিতার প্রকাশ লক্ষ্য করে লেখিকা সীতাদেবীর সঙ্গে আলাপচারিতামূলক স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন--- "পৃথিবীর সঙ্গে যথার্থ পরিচয়ের অভাব তাদের পঙ্গু করে রেখেছে, এইজন্য আমি কখনও কোনো মেয়ের লেখাকে মন থেকে প্রশংসা করতে পারিনি। তাদের সবটাই যেন কল্পনা।"[১৬]

কিন্তু বহির্বিশ্বের সংস্পর্শ থেকে, জ্ঞানবুদ্ধির জগত থেকে মেয়েদেরকে নির্বাসিত করে রেখেছে তো পুরুষসমাজ। অথচ, তারাই আবার মেয়েদের বিরুদ্ধে অসম্পূর্ণতার অভিযোগ তুলতেও ছাড়েনি। 'নারী-পুরুষ সমকক্ষ' ---- একথা মানতে নারাজ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তবে স্বর্ণকুমারী দেবী কিংবা কৃষ্ণভাবিনী দাসের প্রতিবাদী যুক্তিনিষ্ঠ লেখা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের তীব্র বিরোধিতা প্রকাশ পেলেও শরৎকুমারী চৌধুরাণীর লেখা 'একাল ও একালের মেয়ে' নামক অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা ধাঁচের রচনাটি খুবই প্রশংসিত হয়েছিল। শরৎকুমারী দেবীর লেখা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অনুকূল মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছিল। অর্থাৎ অবগুণ্ঠনকে ধার্য করে পুরুষতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত লক্ষ্মণরেখার মধ্যে যেসব লেখিকারা তাঁদের লেখনীকে চালিত করতে পেরেছিলেন, লেখালেখির জগতে তাদের স্থায়িত্ব যে অপেক্ষাকৃত সহজতর হয়েছিল তা বলাই যায়। মানকুমারী বসুকে পুরষ্কৃত করা হয়েছিল (যশোহর খুলনা সম্মিলনী সভা) তাঁর 'পাতিব্রত্যধর্ম বাহিত নারীর প্রধান কর্তব্য' বিষয়ক রচনাটির জন্য। অর্থাৎ পুরুষনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর লেখনী ধারণ করে তার জয়গানের মধ্য দিয়েই লেখিকা হিসেবে স্বীকৃতিলাভ অপেক্ষাকৃত সহজতর হত।

অপরপক্ষে, এমন অনেক লেখিকার দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় যাদের লেখাটিতে নারীবাদী কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছিল বলেই হয়তো তাদের লেখনী কে থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে মনে করেছেন অধ্যাপক সুতপা ভট্টাচার্য। তিনি লিখেছেন, 'বামারচনা সংকলন'-এ গৃহীত শ্রীমতী সারাদা'র লেখা 'বঙ্গদেশীয় লোকদিগের কী কী বিষয়ে কুসংস্কার আছে' শীর্ষক প্রবন্ধটির কথা। যার মধ্য দিয়ে নিছক আক্ষেপ নয়, বরং স্ত্রীজাতির অবনতির জন্য পুরুষসমাজের বিরুদ্ধেই স্পষ্ট অভিযোগ ধ্বনিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর লেখা পরবর্তীকালে কোথাও খুঁজে পাননি তিনি। সুতপা ভট্টাচার্য প্রশ্ন করেছেন, লিঙ্গরাজনীতির কারণেই কি থেমে যেতে হয়েছিল মায়াসুন্দরীকেও?--- 'নারীজন্ম কি অধর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধ আর তার সমালোচনার প্রতিবাদে এই লেখিকারও তো কণ্ঠস্বর ছিল তীব্র, এমনকি পুরুষের পরাধীনতা যে কেবল বাইরের আর নারীর ঘরে-বাইরে দুই দিকেই এই পার্থক্যও তো করতে পেরেছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে তাঁরই বা লেখা কোথায়।"[১৭] মুদ্রিত জগতে পুরুষ প্রতাপের আরও একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়--- *'নবনূর'* পত্রিকায় প্রকাশিত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের 'আমাদের অবনতি' (ভাদ্র, ১৩১১) প্রবন্ধটি, যার মধ্য দিয়ে ধ্বনিত হয়েছিল 'মেয়েদের জন্মের পর থেকেই সমাজ কিভাবে তাকে মেয়ে করে তোলে' সেই বিষয়টি। তিনি লিখেছিলেনঃ

"তুই জন্মেছিস গোলাম, থাকবি গোলাম। সুতরাং আমাদের আত্মা পর্যন্ত গোলাম হইয়া যায়।... ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষ-রচিত বিধান ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মুনিদের বিধানে যে কথা শুনিতে পান, কোনো স্ত্রীমুনির বিধানে হয়ত তাহার বিপরীত কথা দেখিতে পাইবেন।"[১৮]

কিন্তু প্রবন্ধটি *নবনূর*-এ প্রকাশিত হবার পর এত তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয় যে, পরবর্তীতে প্রবন্ধটি যখন মতিচূর গ্রন্থ সংকলনে গৃহীত হয়, তখন এসব অংশ (মূল প্রবন্ধের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ) বাদ দিতে হয় লেখিকাকে। 'আমাদের অবনতি' প্রবন্ধের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'স্ত্রী-জাতির অবনতি'।

অর্থাৎ মেয়েদের লেখা যখন পুরুষ নির্দেশিত গণ্ডীর মধ্যে থেকে স্ত্রীজনোচিত শান্তভাব বজায় রেখেছে তখন তা পুরুষ কর্তৃক প্রশংসা পেয়েছে, পুরষ্কৃত হয়েছে। আর যখন পুরুষের তৈরী করা নিয়মনীতির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছে, তখনই তা সমালোচিত হয়েছে, তাদের কণ্ঠস্বর চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে তৎকালীন সমাজে মেয়েদের লেখার যে একটা প্রভাব ছিল তা বলাই যায়। তাদের লেখা যে একেবারেই গ্রহণযোগ্য ছিল না এমনটা নয়। সমাজনির্দিষ্ট শান্ত স্বভাবের লেখাগুলির গ্রহণযোগ্যতা তো সমাজে ছিলই, তার সাথে সাথে প্রতিবাদধর্মী লেখাগুলোরও গুরুত্ব খুব একটা কম ছিল না। মেয়েদের লেখা প্রতিবাদী রচনাগুলিকে কখনোই সমাজ 'মেয়েলি লেখা' বলে অবহেলা করতে পারে নি, উপেক্ষা করতে পারেনি। বরং বার বার সমালোচনা করে লেখিকাকে সাবধান-সতর্ক করার চেষ্টা করেছে। কারণ পুরুষসমাজের মনে আশঙ্কা কাজ করত – একজন মেয়ের প্রতিবাদী ভাবনায় প্রভাবিত হয়ে সমাজের বাকি মেয়েরাও প্রভাবিত হতে পারে। অর্থাৎ সমাজের ধ্যানধারণা পরিবর্তন করার মতো জোর যে মেয়েদের কলমে ছিল তা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পেরেছিল পুরুষসমাজ। মেয়েদের কলমের যদি কোনোরকম জোর নাই থাকবে--- মেয়েদের মতামতের, ভাবনাচিন্তার যদি কোনোরকম গুরুত্ব নাই থাকে--- তাহলে তারা কি লিখল না লিখল সে বিষয়ে এত মাথাব্যথার কোনো কারণ ছিল না। বারে বারে তাদের সতর্ক করা, তাদের লেখার সীমানা নির্দিষ্ট করে দেওয়া কিংবা নির্ধারিত সীমানার বাইরে লেখা কোনো প্রতিবাদী লেখার এত সমালোচনার কোনো প্রয়োজনীয়তাই থাকত না। হ্যাঁ এটা হয়তো ঠিক যে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ মেয়েদের মতামতকে সেভাবে কখনোই গুরুত্ব দেয় নি। কিন্তু তাদের করা সমালোচনাই বুঝিয়ে দেয় মেয়েদের লেখার সামাজিক গুরুত্ব। হোক না তা নেতিবাচক সমালোচনা।

তথ্যসূত্র:

1) দেবী বামাসুন্দরী, 'ভারতবর্ষীয় রমণীগণের দুরবস্থা মোচনের উপায় কী?', *বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য,* স. সুতপা ভট্টাচার্য, প্রথম সং., কলকাতাঃ সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৯, পৃ. ১
2) ভট্টাচার্য সুতপা, 'ভূমিকা', তদেব, পৃ. ৯
3) গোলাম মুরশিদ, *নারী প্রগতির একশো বছরঃ রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া,* প্রথম সং., ঢাকাঃ অবসর প্রকাশনা, ১৯৯৩, পৃ. ৯০
4) দেবী জ্যোতির্ময়ী, 'চিরন্তন নারী জিজ্ঞাসা', *জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন,* ৪র্থ খ.; স. ঘোষ গৌরকিশোর, প্রথম সং., কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪, পৃ. ১২৪

5) দেবী রাধারাণী, 'সাহিত্যবিচারে পুরুষ-নারী ভেদ', *রাধারাণী দেবীর রচনা-সংকলন,* ১ম খ.; স. সেন অভিজিৎ, প্রথম সং., কলকাতাঃ পুস্তক বিপণি, ১৯৯৯, পৃ. ৭০
6) দেবী জ্যোতির্ময়ী, 'চিরন্তন নারী জিজ্ঞাসা', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০
7) অনামা, 'গৃহস্বামীর কর্তব্য', *বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য,* স. সুতপা ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২।
8) চৌধুরাণী সরলাদেবী, *জীবনের ঝরাপাতা,* ১ম দে'জ সং., কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ২০০৭, পৃ. ১০১
9) দেবী রাধারাণী, 'সাহিত্যবিচারে পুরুষ-নারী ভেদ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮
10) বেগম রোকেয়া, *রোকেয়া রচনাবলী,* স. কাদির আবদুল, প্রথম সং., ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭১, পৃ. ৫৭৬
11) সুতপা ভট্টাচার্য, 'ভূমিকা', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
12) মুস্তাফী নগেন্দ্রবালা, 'অবরোধে হীনাবস্থা', *নারী ও পরিবারঃ বামাবোধিনী পত্রিকা ১২৭০-১৩২৯ বঙ্গাব্দ,* স. ভারতী রায়, প্রথম সং., কলকাতাঃ পুস্তক বিপণি, ১৯৯৯, পৃ. ১৮৪-১৮৫
13) মুস্তাফী নগেন্দ্রবালা, 'হিন্দুরমণী', তদেব, পৃ. ১৮৬
14) চন্দ শ্রীরানী, *আলাপচারি-রবীন্দ্রনাথ,* প্রথম সং., কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৪৯, পৃ. ৪১
15) চিত্রা দেব, *ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল,* তৃতীয় সং., কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৪, পৃ. ৪৮
16) দেবী সীতা, *পুণ্যস্মৃতি,* প্রথম সং., কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৪২, পৃ. ১৯২
17) ভট্টাচার্য সুতপা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৩
18) বেগম রোকেয়া, 'আমাদের অবনতি', *জানানা মহ্‌ফিলঃ বাঙালি মুসলমান লেখিকাদের নির্বাচিত রচনা ১৯০৪-১৯৩৮,* স. আখতার শাহীন ও ভৌমিক মৌসুমী, প্রথম সং., কলকাতাঃ স্ত্রী, ১৯৯৮, পৃ. ১৯-২০